বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

046

তারিখ 14 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

পৌনে দুই লাখ ফেল: এই দায়িত্ব কার?

এক লক্ষ ছেয়াত্তর হাজার উনননব্বই জন ফেল। সদ্য প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল। এই ফলাফল দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের, ১৯৮৮ সালের। সব ক'টি বোর্ড মিলিয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশ' বিশ। ফেলের হার ছাপ্পান্ন ভাগ।

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নয়, গরিষ্ঠ সংখ্যকের ফলাফলই দেশের শিক্ষার মানদন্ড নির্ণয়ের পন্থা বলে 'উত্তীর্ণ' চুয়াল্লিশ ভাগ ঠেলে রেখে অনুত্তীর্ণ ছাপ্পান্ন ভাগের এমন করে উল্লেখ। ভাগ্য বিপর্যস্ত হলেও গরিষ্ঠদের হেলাফেলা করার পথ নেই।

নেই বলেই অজস্র জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়েছে। হয়েছে এই ফলাফলকে কেন্দ্র করে। বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়—বোর্ডগুলোর পাস-ফেলের পার্সেন্টেজ-এও তারতম্য বিস্তর। ঢাকায় পাসের হার সর্বোচ্চ অর্থাৎ সাতান্ন, যশোরে মাত্র উনত্রিশ অর্থাৎ সর্বনিম্ন। আবার রাজশাহী চৌত্রিশ, কুমিল্লা একান্ন। এই বৈষম্যও বিরাট প্রশ্ন।

কোনও একটি বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা বেশি সংখ্যক ভাল হয়ে যাবে। কোনও কোনও বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের বিপুল সংখ্যার মগজ অপাংক্তেয় হবে—এমনটি মেনে নেয়া কষ্টকরই বটে। বিশেষজ্ঞ বোর্ডগুলো পাঠ্যসূচী ও মানবন্টনে সমতা আর সামঞ্জস্যই রক্ষা করে চলেন বলে যখন সবাই জানে।

পাঠ্যসূচী থেকে শুরু করে প্রশ্ন-ধারা, নম্বর-বাঁটোয়ারা তারিখ, রুটিন সবই যখন সমন্বিত পদ্ধতির, এমন কি ফলাফল ঘোষণা অবধি। তখন ফলাফলে এমন চিন্তা-বিদারক অসমতা কেন?

জবাব হতে পারে, ছাত্র যদি না লেখে অথবা ভুল লেখে কিংবা নকল করে বহিষ্কার হয়, তবে পাস হবে কী করে? তাকে বা তাদেরকে ফেল কেউ করায় না, আপন অক্ষমতায় তারা ফেল করে। কথাগুলো পুরনো। তাই বড় কঠিন ধোপে টেকানো।

পরীক্ষার পদ্ধতি, প্রণালী, পথ, পরিবেশ—সবই বড়দের নিয়ন্ত্রণে—ছাত্র বা পরীক্ষার্থী সেখানে নিষ্ক্রিয়। তাদের বিষয় আবশ্যক বা অনাবশ্যক করা হয় বড়দেরই ভাবনায়, বিবেচনায়। উদ্দেশ্য অগ্রসরতা।

কিন্তু ক্রম-অগ্রসরমানতায় যে 'স্থির লক্ষ্য' থাকা দরকার—তারই যেন সংকট। এ সংকটের দরুনই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রম। শিক্ষা-পদ্ধতি, পরীক্ষা নীতি ইত্যাদি নিয়ে যেসব কাজকারবার চলছে, তা অনেকটা প্রহসনে পরিণত হয়ে পড়ছে।

লক্ষ্যহীন শিক্ষা-আদর্শ নিয়ে পরীক্ষাকে আবার বড় বেশি 'লক্ষ্য' করার যে অভ্যাস, তাও আজ এক ধরনের আদর্শে দাঁড়িয়ে গেছে। এও সম্ভব হয়েছে পরীক্ষা পদ্ধতির কল্যাণে। বিষয়বস্তু নয়—কিছু প্রশ্ন পড়লেই চলে যে, এ অমোঘ সত্য নার্সারী থেকেই শিক্ষার্থী রফত করে—তাই শিশু শ্রেণীতেও দেখা যায়—শিশু বেছে বেছে 'ইম্পর্টেন্ট' দাগাচ্ছে ও মুখস্থ করছে।

এই ইম্পর্টেন্ট-এর অনুসন্ধান ছাত্র মাত্রেরই রন্ধ্রে রন্ধ্রে এবং একে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে শ্রেণী বহির্ভূত বিশেষ পাঠপদ্ধতির মাধ্যমে। লক্ষ্য করার বিষয়—প্রতি বিষয়ে গ্রুপ বা একক কোচিং মাত্র কয়েক মাসে সমাপ্ত হয়। এ সমাপ্তি আর কিছু নয়—নির্দিষ্ট বাছা বাছা প্রশ্নের উন্নত দিক-নিদর্শন। ছাত্র জীবনের তপস্যা যে অধ্যয়ন, তা আজ অতীত এবং মাত্রই প্রবাদ। আজকের ছাত্র-ও অছাত্রদের মতো মহা ব্যস্ত। অর্থোপার্জন বা সাইড কিছু করার দায়ও অনেক তার ওপর ন্যস্ত হয়। সত্য বটে, আজকের ছাত্রকে কুয়োর ব্যাঙ বা হাঁসের বাচ্চার ডোবা হলেই চলে না, তার জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞান সম্পন্ন যেমন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন নেই অভিজ্ঞানের দিগন্ত প্রসারণ। এ কারণেই আজ পাঠ্যসূচীতে যেমন, তেমনি পাঠের বাইরেও তার জন্য অনেক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক আয়োজন।

এ সবই উত্তম। কিন্তু এর পরেও ক'জন বা ক'পার্সেন্ট ছাত্র এমন পরিবেশে উপকৃত? না হলে, কেন নয়?

যে ছাত্রটি মনোযোগী হয়, তার অন্তর্নিহিত কারণ একাধিক হতে পারে, তার মননশীলতা অথবা তার ঘরের পরিস্থিতি অর্থাৎ লালিত সহযোগিতা কিংবা দুটোই। আর যে মনোযোগী নয়, তার কারণও একইভাবে একটি নয়। হয় সে স্বভাবগতভাবে চঞ্চল, নয় তার গৃহে যত্নের বা সামর্থ্যের অভাব, নয় দুটোই। এখন বিচার্য হচ্ছে—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কক্ষে থাকে উভয় ধরনের শিক্ষার্থীই। পরিবেশ, ঐতিহ্য, মন, মননশীলতা, সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে বিপুল বৈচিত্র্য। এতো, বৈচিত্র্যের সম্ভার নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একমুখী, অনড়, আপোসহীন হলে চলে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা জীবন্ত প্রাণ নিয়ে নয় শুধু উচ্ছল বাড়ন্ত জীবন নিয়ে কাজ করে এবং সে সঙ্গে দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই জীবনকে তার মতো করে গড়ে তোলার। এ বিচারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর যে কোনো স্তরেরই হোক, গুরুত্ব এক কথায় অতুলনীয়। বিশদ বিবরণে না গিয়ে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্যণীয়, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত একজন শিক্ষার্থী। ঘন্টা, সময়, ক্লাস, হোমটাস্ক, ছুটি-ছাটা ইউনিফর্ম, অনুষ্ঠান, রুটিন—সবই শুষ্ক, রীতি মাফিক এবং কট্টরভাবে ঘড়ির কাঁটা-নির্ভর। ঘড়ির কাঁটা আর ক্যালেন্ডারই হচ্ছে আজকের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশক।

আমাদের দেশে অভিভাবকদের গরিষ্ঠ অংশ শিক্ষা বঞ্চিত ও সংগতিহীন। শিক্ষাঙ্গনে যারা আসে, যারা আসতে পারে—তাদেরও বিশাল অংশটি ঘরে আলোহারা। কষ্টে উপার্জিত অর্থে এই অভিভাবকেরা যখন সন্তানকে পড়তে পাঠান, তখন নিশ্চয়ই আশা করেন না। তার জন্য বিশেষ কোচিং-এ বাড়তি ব্যয় অনিবার্য হবে। নইলে 'কিছুই জানে না' 'অবাধ্য' অথবা 'প্রবলেম চাইল্ড' বলে তাঁর সন্তান প্রতিষ্ঠানে চিহ্নিত হবে এবং পিছের সারিতে 'ব্যাক বেঞ্চার' হবে।

'ব্যাক বেঞ্চার' শিক্ষার্থীর অনুভূতি আছে কি নেই, তা স্কুল বা কলেজ কখনোই জানতে চায় না। কিন্তু বিশ্লেষণে ধরা পড়বে। এদের মধ্যে এমনি করেই জন্ম নেয় 'কমপ্লেক্সের'—যে কমপ্লেক্স তাকে আত্মবিশ্বাসহীন এক আজব প্রাণে পরিণত করে—পরিণামে, হয় সে মেরুদন্ডহীন অদৃষ্ট বাদী। নয় অপমানে অবমাননায় আক্রমণাত্মক ভূমিকায় নামে। নামে অন্যায় ও অপরাধে। সেই অন্যায় ও সেই অপরাধ।

শাসন করলে বহিষ্কার, ক্লাস-পালালে বহিষ্কার। চারিদিকে শাস্তির খড়্গ। কোথায় ছাত্রের জন্য পথ-নির্দেশ, কোথায় সহযোগিতা, সহমর্মিতা, কোথায় পথ সংশোধনের?

তাই দিন-এনে-দিন-খাওয়া অথবা মাস-এনে-মাস খাওয়া সংকট-জর্জর পরিবারের একটি ছেলে যখন দেশের প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞদের লেখা পুঁথিপুস্তক থেকে সঠিক বিষয় আহরণে ও তা খাতায় উপস্থাপনে অপারগ হয়, তখন সে প্রতিষ্ঠিত রীতির গুণে 'ব্যর্থ' বলে চিহ্নিত হয়। এ ব্যর্থতায় তার সুপ্ত মানবিক গুণাবলীই যে শুধু লাঞ্ছিত হয়, তা নয়—তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাও ভূলুণ্ঠিত হয়।

তবু শেষ পর্যন্ত ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে তারই। সে ব্যর্থ বলে চিহ্নিত হয়। এ চিন্তায় ধরা পড়বে—আমাদের কায়দাকানুন কৌশল কতো অসার। সুকুমার মনের ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের ব্যর্থতা আমাদেরই, এই ব্যর্থতা লজ্জার ও দুঃখের।

বিচিত্র পরীক্ষাপদ্ধতিতে উত্তর পত্র মূল্যায়নের যে নীতি—তা বিশ্বস্ত নয়। পরীক্ষকের মন, মানসিকতা, চিন্তা, চেতনা, সংকট সংগ্রাম অর্থাৎ তাঁর পুরো মন ও মানসিক অবস্থা এবং জাগতিক অবস্থান—একটি উত্তরপত্রের মূল্যমান নির্ধারণে প্রধান নিয়ন্ত্রক।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা, পাঠ্যসূচীর বিন্যাস, শিক্ষকদের যোগ্যতা, সদিচ্ছা সম্পর্কে সংশয় পরীক্ষার প্রশ্ন-প্রণয়ন, পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি এ সবই পরীক্ষার ফলাফলের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

অবকাশ নেই। একেক বোর্ডের একেক ধরনের পার্সেন্টেজও শিরোধার্য করে সন্তোষ প্রকাশের অথবা দুঃখ করার কারণ থাকতে পারে না। পারে না, কেননা আজ যারা বোর্ডে 'ফেল' বলে চিহ্নিত হয়েছে, আমাদের সমুদয় ব্যবস্থাই পাসের নম্বরটিও পাওয়ার ক্ষমতা হয় না একজন ছাত্রের পক্ষে যে কারণে, সে কারণ নিহিত ছাত্রের মগজে নয়—আমাদের কারসাজিতে। এমনিতেই লক্ষ লক্ষ ছাত্র পড়াশোনার বাইরে ধুঁকে ধুঁকে জীবণ কাটাচ্ছে, পরীক্ষা তাদের কাছে অলীক কল্পনা মাত্র, তাই যে ক্ষীণ সংখ্যক অবতীর্ণ হতে পেরেছে পরীক্ষায় কৃপালের জোরে, তাদের মধ্যে থেকে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ ছাত্রের ফেল হওয়ার সংবাদ সচেতন নাগরিকদের বুকে কাঁটার মতোন বিঁধছে।

—হোসনে আরা শাহেদ